



রবীন্দ্রসাহিত্যে প্রেমচেতনার আধুনিকতা : প্রসঙ্গ “শেষের কবিতা”

শিখা ঘোষ†

বিষয়-চুম্বক :

বাংলা সাহিত্যাকাশের ধ্রুবতারা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং তাঁর রচনা কেবল আধুনিক নয়— অনেকাংশেই অত্যাধুনিক। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর হলেন সেই শাস্ত্রতন্ত্র যাঁর সৃষ্টি সমকালকে ছাপিয়ে হয়ে উঠেছে চিরকালীন। সাহিত্যের এমনই এক শাস্ত্রতন্ত্র হল প্রেম। এই প্রেমচেতনার প্রকাশে রবীন্দ্রসাহিত্যে প্রতিফলিত হয়েছে এক আধুনিক মনন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মনন ও তাঁর সৃষ্ট সাহিত্যের আধুনিকতার প্রতিফলন কীভাবে ‘শেষের কবিতা’ উপন্যাসে প্রকাশিত হয়েছে তাই আমার প্রবন্ধের মূল আলোচ্য বিষয়।

সূচক-শব্দ : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সাহিত্যে আধুনিকতা, আধুনিক মনন, প্রেম, বন্ধনহীনতা, নতুনের বার্তাবাহী।

বাংলার সাহিত্যাকাশের উজ্জ্বলতম নক্ষত্র আমাদের প্রিয় রবি— কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। তাঁর সৃষ্ট সাহিত্যের আধুনিকতার বোধ নিয়ে বিশিষ্ট রবীন্দ্রগবেষণা নানা প্রতীক ও প্রবন্ধ রচনা করেছেন। তাঁদের মধ্যে বিশেষভাবে স্মরণীয় আবু সয়ীদ আইয়ুব রচিত ‘আধুনিকতা ও রবীন্দ্রনাথ’ গ্রন্থটি। তবে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং তাঁর রচনা কেবল আধুনিক নয়— অনেকাংশেই অত্যাধুনিক। আসলে আধুনিকতা বিষয়টি সময় নিয়ে নয়, মর্জি নিয়ে— একথা অনেকাংশেই সত্য। কারণ একই সময়ে সৃষ্ট বিভিন্ন সাহিত্যিকের রচনার ভাব, ভাষা, ভঙ্গি, চিন্তা-চেতনার মধ্যে বিস্তর ফারাক দৃষ্ট হয়। বর্তমানে দাঁড়িয়ে যাকে চরমতম আধুনিক বলে মনে হয়, কালপ্রবাহে তাই হয়ে দাঁড়ায় সেকেলে। কিন্তু কোনো কোনো সাহিত্যিক এমনই হন, যাঁদের সৃষ্টি

† Assistant Teacher in Bengali, Anandanagar High School (H.S.), Howrah, and Guest Lecturer, Department of Bengali Language & Literature (PG), Uluberua College, Howrah, West Bengal, India.

সমকালকে ছাপিয়ে হয়ে ওঠে শাস্ত্র বা চিরকালীন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সেই শাস্ত্র স্রষ্টা। সাহিত্যের এমনই এক শাস্ত্র প্রকরণ হল প্রেম। এই প্রেমচেতনার প্রকাশে রবীন্দ্রসাহিত্যে কতখানি আধুনিক মনন প্রতিফলিত হয়েছে তাই আমার প্রবন্ধের মূল আলোচ্য বিষয়। আর বিষয়ের আধেয় রবীন্দ্র উপন্যাস ‘শেষের কবিতা’।

প্রেমসম্পর্কে আধুনিকতার বীজবপন করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ তাঁর ‘চোখের বালি’ উপন্যাসে মহেন্দ্র-বিনোদিনী-বিহারীর ত্রিকোণ প্রেম সম্পর্কে সূচনা দিয়ে। যদিও বঙ্কিমচন্দ্র এর পূর্বেই ‘বিষবৃক্ষ’ উপন্যাসে এই ত্রিকোণ প্রেমের আখ্যান রচনা করেছিলেন, কিংবা ‘কৃষ্ণকান্তের উইল’ উপন্যাসের ভ্রমর গোবিন্দলাল ও রোহিণীর সম্পর্কের জটিলতা তৈরি হয়েছিল, তবুও নীতিবাগীশ বঙ্কিম তাঁর নায়িকাদের আত্মহত্যা কিংবা গুলি করে হত্যার মধ্যে দিয়ে মৃত্যু পরিণতি দিয়েছিলেন, সেখানে রবীন্দ্রনাথ ‘চোখের বালি’ -তে বিনোদিনীকে কাশীবাসী করলেন, মৃত্যুদণ্ডের পরিবর্তে। ‘যোগাযোগ’ উপন্যাসের চরম আধুনিক মানসিকতার কুমুদিনীও শেষ পর্যন্ত মাতৃহত্যার কারণে মধুসূদনের বিত্ত ও ভোগের পায়ে আত্মসম্পর্ক করতে বাধ্য হয়। অথচ একই সালে (১৯২৯ খ্রিস্টাব্দে) প্রকাশিত ‘শেষের কবিতা’ উপন্যাসে রবীন্দ্রনাথ আধুনিক নর-নারীর প্রেম সম্পর্কিত ভাবনাকে এক গদ্য-পদ্যের মিলিত শব্দবন্ধে, বাঁ-চকচকে বাচনভঙ্গিতে যেভাবে তুলে ধরলেন তাঁর আটষটি বছর বয়সের রচনায় তা সমগ্র বাংলা সাহিত্যে অভিনব।

‘শেষের কবিতা’ গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়েছিল ১৩৩৬ সালের ভাদ্র মাসে। ১৩৩৫ সালে ভাদ্র থেকে চৈত্র পর্যন্ত আট মাস ধরে গ্রন্থটি ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়েছিল ‘প্রবাসী’ পত্রিকায়। আর এটি রচিত হয়েছিল তারও কয়েকমাস পূর্বে কবির দাক্ষিণাত্য ভ্রমণ কালে। বইটির নাম ছিল তখন—‘মিতা’। সম্ভবত কবি এই উপন্যাস রচনা শুরু করেন ইংরেজি ১৯২৮ সালের মে মাসের তৃতীয় সপ্তাহে কুন্নুরে এবং সমাপ্তি ২৫ জুন ব্যাঙ্গালোরে আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীলের আতিথেয়, তাঁর ব্যালাক্রয়ি’ নিকেতনে। শ্রীমতী নির্মলকুমারী মহলানবীশ রচিত ‘কবির সঙ্গে দাক্ষিণাত্যে’ নামক গ্রন্থ থেকে এই উপন্যাস রচনার প্রেক্ষাপট জানা যায়।

যদিও এই গল্পের সঙ্গে উপন্যাসের বিস্তার পার্থক্য, মিল কেবল শিলং পাহাড়ে মোটর দুর্ঘটনা এবং রোমাণ্টিক প্রেমের আমেজ টুকুতেই।

এই উপন্যাসে রবীন্দ্রনাথ অমিত-লাবণ্য-কেতকী-শোভনলাল মূলত এই চার চরিত্রের মধ্য দিয়ে প্রেমের এক আধুনিক মনোভাবনা তুলে ধরেছেন অমিত-লাবণ্যর একে-অপরকে ভালোবাসা এবং ভালোবেসেই দূরে চলে যাওয়ার মধ্য দিয়ে বন্ধনহীন প্রেমের গ্রন্থি রচিত হয়েছে। তাই অমিত ফিরে গেছে কেতকীর কাছে, আর লাবণ্য-শোভনলালের কাছে। অমিতর মনে হয়েছে কেতকীর সঙ্গে তার ভালোবাসারই সম্বন্ধ, সে যেন তার ঘড়ায় তোলা জল—যা প্রতিদিনের ব্যবহার্য; কিন্তু লাবণ্য হল তার ভালোবাসার দীঘি—যেখানে তার মন সাঁতার দেবে। তাই তার ভালোবাসার বাসা আর ওড়ার আকাশ একসঙ্গেই থাকল। প্রেমের পরিণতি সম্বন্ধে এমন কথা আধুনিকতম মানুষকেও ভাবায়—যা রবীন্দ্রনাথ ১৯২৯-এ ‘শেষের কবিতা’ উপন্যাসে বললেন। এ প্রসঙ্গে সুজয় বসাক বলেছেন—

“নরনারীর প্রেমের প্রাত্যহিক রূপ ও তার লোকান্তর শাস্ত্রত অনুভব—এই দুইয়ের দ্বন্দ্বময় জিজ্ঞাসা রবীন্দ্র চेतনার এক বিশিষ্ট মাত্রা। অস্থির আবেগময় অমিত ও শেষপর্যন্ত প্রেমের সংঘাতে অপ্রাপ্তির বেদনায় উপন্যাসের পরিণামে নবতমবোধে সুস্থির হয়।

প্রেম বিবাহে পরিণতি না পেলেও ক্ষতি নেই—এই তত্ত্ব যেমন ‘শেষের কবিতা’য় প্রতিফলিত হয়, তেমনি বিবাহোত্তর প্রেমের কথাও আছে। অবশ্য এই উপন্যাসে রবীন্দ্রনাথ রক্ষণশীলও বটে; কেননা, নায়ক-নায়িকারা দেহের বহিরঙ্গে আবেগ ঘন সান্নিধ্যে বা মিলনে সন্তুষ্ট থেকেছে। এই কথা উগ্র আধুনিক অমিত রায়ের পক্ষেও সত্য। আসলে রবীন্দ্রনাথের এই সীমাবদ্ধতা আধুনিকতার পর্বে উপনীত হয়েও রক্ষণশীলতাকে মুছে ফেলতে পারে না। অবশ্য অতিঅগ্রসরতা হয়তো অতি আধুনিকতা যা রবীন্দ্রনাথ মেনে নিতে পারেন নি।” (বসাক, ১৯৭০, পৃ.

১৩৭)

‘শেষের কবিতা’র অভিনবত্ব বা আধুনিকতা প্রকাশিত হয়েছে এর ভাষাভঙ্গিতে। অমিত রায় হয়েছে অমিট রায় (রে)। কেতকী হল কেটি। ইংরেজিয়ানার প্রভাব সর্বত্র। অমিত নবীন লেখক, সে বলে—‘ফ্যাশানটা হল মুখোশ, স্টাইলটা মুখশ্রী’। অমিত-র ধুতি পাঞ্জাবি, পায়ে সাদা চামড়ার ওপর লাল চামড়ার কটকি জুতো, কোমরের ট্যাকঘড়ি, কাঁধের মাদ্রাজি চাদর আর ইংরেজি-বাংলা মেশানো মুখের বুলি—সবমিলিয়েই সে অভিনব।

শুধু অমিতর নয়, তার বোন সিসি ও লিসির যে বর্ণনা রবীন্দ্রনাথ দিয়েছেন সেখানেও তাঁর আধুনিক বিচক্ষণ দৃষ্টিভঙ্গিই প্রকাশিত—

“এদিকে ওর দুই বোন, যাদের ডাক নাম সিসি এবং লিসি, যেন নতুন বাজারে অত্যন্ত হালের আমদানি— ফ্যাশানের পসরায় আপাদমস্তক যত্নে মোড়ক-করা পয়লা নম্বরের প্যাকেট-বিশেষ। উঁচু খুরওয়ালা জুতো, লেসওয়ালা বুক কাটা জ্যাকেটের ফাঁকে প্রবালে অ্যাম্বারে মেশানো মালা, শাড়িটা গায়ে তির্যগ্ভঙ্গিতে আঁট করে ল্যাপটানো। এরা খুট খুট করে দ্রুত লয়ে চলে; উচ্চৈঃস্বরে বলে; স্তরে স্তরে তোলে সূক্ষ্মাগ্র হাসি, মুখ ঈষৎ বেঁকিয়ে স্মিতহাস্যে উঁচু কটাক্ষে চায়, জানে কাকে বলে ভাবগর্ভ চাউনি; গোলাপি রেশমের পাখা ক্ষণে ক্ষণে গালের কাছে ফুর ফুর করে সঞ্চালন করে, এবং পুরুষবন্ধুর চৌকির হাতার উপরে বসে সেই পাখার আঘাতে তাদের কৃত্রিম তর্জন প্রকাশ পেতে থাকে।” (রবীন্দ্র রচনাবলী, নবম খন্ড, পৃ. ৫০৮)

‘শেষের কবিতা’ উপন্যাসের উক্তিগুলোর মধ্যেও এক অদ্ভুত মাদকতা আছে, যা অত্যন্ত অভিনব। অমিতর মধ্য দিয়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর সমকালে রবীন্দ্রসমালোচকদের মানসিকতার প্রতি তীব্র কটাক্ষ তুলে ধরেছেন, আত্মসমালোচনার চুলচেরা বিশ্লেষণ করেছেন—

‘একদিন ওদের বালিগঞ্জের এক সাহিত্যসভায় রবি ঠাকুরের কবিতা ছিল আলোচনার বিষয়। অমিতর জীবনে এই সে প্রথম সভাপতি হতে রাজি হয়েছিল; গিয়েছিল মনে মনে যুদ্ধসাজ প’রে।...

সভাপতি উঠে বললেন, “কবিমাত্রের উচিৎ পাঁচ-বছর মেয়াদে কবিত্ব করা, পঁচিশ থেকে ত্রিশ পর্যন্ত। একথা বলব না যে, পরবর্তীদের কাছ থেকে আরো ভালো কিছু চাই, বলব অন্য কিছু চাই। ফজলি আম ফুরোলে বলব না, আনো ফজলিতর আম।” বলব, “নতুন বাজার থেকে বড়ো দেখে আতা নিয়ে এসো তো হে।”... রবি ঠাকুরের বিরুদ্ধে সবচেয়ে বড়ো নালিশ এই যে, বুড়ো ও ওয়ার্ডস ওঅর্থের নকল করে ভদ্রলোক অতি অন্যায়রকম বেঁচে আছে। যম বাতি নিবিয়ে দেবার জন্যে থেকে থেকে ফরাশ পাঠায়, তবু লোকটা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েও চৌকির হাতা আঁকড়িয়ে থাকে। ও যদি মানে মানে নিজেই সরে না পড়ে, আমাদের কর্তব্য ওর সভা ছেড়ে দল বেঁধে উঠে আসা। ... পূজা জিনিসটাকে একঘেয়ে করে তোলার মতো অপবিত্র অধার্মিকতা আর কিছু হতে পারে না। ... ভালো লাগার এভোল্যুশন আছে। পাঁচ বছর পূর্বেকার ভালো-লাগা পাঁচ বছর পরেও যদি

একই জায়গায় খাড়া দাঁড়িয়ে থাকে তা হলে বুঝতে হবে, বেচারা জানতে পারেনি যে সে মরে গেছে। ...রবি ঠাকুরের দলের এই অবৈধ ষড়যন্ত্র আমি পাব্লিকের কাছে প্রকাশ করব বলে প্রতিজ্ঞা করেছি। (রবীন্দ্র রচনাবলী, নবম খন্ড, পৃ. ৫১১)

অমিত রায় কথার ফুলঝুরিতে অত্যন্ত সাবলীলভাবে আলোকিত করে মেয়েদের মন। এ ব্যাপারে তার ক্ষমতা অসাধারণ, এ প্রসঙ্গে কবি বলেছেন—

‘মেয়েদের সম্বন্ধে ওর মন তর্কই করে, মীমাংসায় আসে না। সেইজন্যেই গম্যবিহীন আলাপের পথে ওর এত দুঃসাহস। তাই অতি সহজেই সকলের সঙ্গে ও ভাব করতে পারে, নিকটে দাহ্যবস্তু থাকলেও ওর তরফে আগ্নেয়তা নিরাপদে সুরক্ষিত।’

সেদিন পিকনিকে গঙ্গার ধারে যখন ও পারের ঘন কালো পুঞ্জীভূত স্তম্ভতার উপরে চাঁদ উঠল, ওর পাশে ছিল লিলি গাঙ্গুলি। তাকে ও মৃদুস্বরে বললে, “গঙ্গার ও পারে ঐ নতুন চাঁদ, আর এ পারে তুমি আর আমি, এমন সমাবেশটি অনন্তকালের মধ্যে কোনোদিনই আর হবে না।

...

কিন্তু লিলি, কোটি কোটি যুগের পর যদি দৈবাৎ তোমাতে আমাতে মঙ্গলগ্রহের লাল অরণ্যের ছায়ায় তার কোনো একটা হাজার ক্রেনশী খালের ধারে মুখোমুখি দেখা হয়, আর যদি শকুন্তলার সেই জেলেটা বোয়াল মাছের পেট চিরে আজকের এই অপরূপ সোনার মুহূর্তটিকে আমাদের সামনে এনে ধরে, চমকে উঠে মুখ-চাওয়া-চাউয়ি করব, তার পরে কী হবে ভেবে দেখো।” (রবীন্দ্র রচনাবলী, নবম খন্ড, পৃ. ৫০৯)

‘শেষের কবিতা’ উপন্যাসের বাচনভঙ্গি কেবল নয়, এই উপন্যাসের কবিতার ব্যবহারও অপূর্ব। রচনাভঙ্গির আধুনিকতা অনুসরণযোগ্য এবং তা তৎকালে যাঁরা নিজেদের আধুনিক কবি-সাহিত্যিক বলে দাবী করতেন তাঁদেরও চমৎকৃত করেছিল। এই কবিতার প্রেমভাবনা প্রতিটি কবিতার মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত হলেও শেষ কবিতায় তা অনবদ্য হয়ে উঠেছে। অমিতকে লেখা লাবণ্যর শেষ চিঠি, যাতে একদিকে আছে শোভনলালের সঙ্গে তার বিবাহের খবর, আর একদিকে এই কবিতা—

“কালের যাত্রার ধ্বনি শুনতে কি পাও।

তারি রথ নিত্যই উধাও

জাগাইছে অন্তরীক্ষে হৃদয়স্পন্দন,

চক্রে-পিষ্ট আঁধারের বক্ষফাটা তারার ক্রন্দন।

... ..

তোমারে যা দিয়েছি সে তোমারি দান—

গ্রহণ করেছে যত ঋণী তত করেছে আমায়।

হে বন্ধু, বিদায়।” (রবীন্দ্র রচনাবলী, নবম খন্ড, পৃ. ৫৭৩, ৫৭৫)

এইভাবে সমগ্র ‘শেষের কবিতা’ উপন্যাসে রবীন্দ্র মননের আধুনিকতার নানা দিক প্রতিফলিত হয়েছে।

এ প্রসঙ্গে সত্যব্রত দে বলেছেন—

“শেষের কবিতার রচনারীতির অভিনবত্বে প্রকাশিত হয়েছে আরও একটি বৈশিষ্ট্য। গদ্য বর্ণনার ফাঁকে ফাঁকে এতে পাত্র-পাত্রীরা কবিতার ব্যবহার করেছে। এই কবিতাগুলি কিন্তু মোটেই অবান্তর নয়। গ্রন্থখানির সামগ্রিক তাৎপর্য উপলব্ধির জন্যে এই কবিতাগুলি অপরিহার্য। ...উপন্যাসে কবিতার এই ধরনের ব্যবহার— চম্পুরীতির এই অভিনবত্বের জন্যেও ‘শেষের কবিতা’র স্বাভাবিক স্বীকার্য।” (দে, ২০১০, পৃ. ২৯২)

আসলে আধুনিকতা বলতে পুরাতনের প্রতি অশ্রদ্ধা নয়, বরং আধুনিকতা মানে পুরাতনকে শ্রদ্ধা করে নতুনের পথে অগ্রসর হওয়া, যার মধ্যে থাকবে সার্বভৌমিকতা, সর্ব মানবের মুক্তির বাণী। আধুনিক ইংরেজি কাব্য ও তার উপভোক্তাদের স্বরূপ বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ তাঁর ‘আত্মপরিচয়’ প্রবন্ধগ্রন্থের অন্তর্গত ‘সাহিত্যে আধুনিকতা’ প্রবন্ধে বলেছেন—

“আমাদের দেশের তরুণদের মধ্যে কাউকে কাউকে দেখেছি যাঁরা আধুনিক ইংরেজি কাব্য কেবল যে বোঝেন তা নয়, সম্ভোগও করেন। তাঁরা আমার চেয়ে আধুনিক কালের অধিকতর নিকটবর্তী বলেই যুরোপের আধুনিক সাহিত্য হয়তো তাঁদের কাছে দূরবর্তী নয়। সেইজন্য তাঁদের সাক্ষ্যকে আমি মূল্যবান বলেই শ্রদ্ধা করি। কেবল

একটা সংশয় মন থেকে যায় না। নূতন যখন পূর্ববর্তী পুরাতনকে উদ্ধৃতভাবে উপেক্ষা ও প্রতিবাদ করে তখন দুঃসাহসিক তরুণের মন তাকে যে বাহবা দেয় সকল সময়ে তার মধ্যে নিত্যসত্যের প্রামাণিকতা মেলে না। নূতনের বিদ্রোহ অনেক সময় একটা স্পর্ধামাত্র। আমি এই বলি, বিজ্ঞানে মানুষের কাছে প্রাকৃতিক সত্য আপন নূতন নূতন জ্ঞানের ভিত্তি অব্যাহত করে, কিন্তু মানুষের আনন্দলোক যুগে যুগে আপন সীমানা বিস্তার করতে পারে কিন্তু ভিত্তি বদল করে না। যে সৌন্দর্য, যে প্রেম, যে মহত্বে মানুষ চিরদিন স্বভাবতই উদ্ভোধিত হয়েছে তার তো বয়সের সীমা নেই, ...সাহিত্য সর্বদেশে এই কথাই প্রমাণ করে আসছে যে, মানুষের আনন্দনিকেতন চিরপুরাতন। কালিদাসের মেঘদূতে মানুষ আপন চিরপুরাতন বিরহ-বেদনারই স্বাদ পেয়ে আনন্দিত। সেই চিরপুরাতনের চিরনূতনত্ব বহন করেছে মানুষের সাহিত্য, মানুষের শিল্পকলা। এইজন্যেই মানুষের সাহিত্য, মানুষের শিল্পকলা সর্বমানবের।” (রবীন্দ্র রচনাবলী, প্রথমখণ্ড, ২০১১, পৃ. ৭৬৯)

‘শেষের কবিতা’ উপন্যাসে এই আধুনিক প্রেমচেতনার প্রতিফলনই সার্থকভাবে ঘটিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ একথা অনস্বীকার্য। তাই রবীন্দ্রসাহিত্য তো বটেই, সমগ্র বাংলা সাহিত্যে ‘শেষের কবিতা’ নতুনের বার্তাবাহী-আধুনিকের মধ্যেও আধুনিকতম।

তথ্যসূত্র :

বসাক, সুজয়. (১৯৭০, অগাস্ট). ‘রবীন্দ্রনাথের শেষের কবিতা : শিল্পিত অনুভবে’, বামা পুস্তকালয়, গ্রন্থবিকাশ, পৃ. ১৩৭

দে, সত্যব্রত. (২০১০, জুলাই). ‘রবীন্দ্র উপন্যাস সমীক্ষা’, প্রজ্ঞাবিকাশ, তৃতীয় সং, পৃ. ২৯২

রবীন্দ্র রচনাবলী, প্রথমখণ্ড, (২০১১, মে). কামিনী প্রকাশন, ৪র্থ সং, পৃ. ৭৬৯

রবীন্দ্র রচনাবলী, নবম খণ্ড, (২০১১, মে). কামিনী প্রকাশন, ৪র্থ সং, পৃ. ৫০৮-৫০৯

তদেব, পৃ. ৫১১

তদেব, পৃ. ৫০৯

তদেব, পৃ. ৫৭৩, ৫৭৫